রহস্যময় উৎস থেকে পৃথিবীকে সংকেত

আশফাক আহমেদ

পৃথিবীর দিকে রেডিও সংকেত পাঠাচ্ছে এক অজানা উৎস। বিজ্ঞানীদের দাবি, ১৯৮৮ সাল থেকে রহস্যময় উৎস থেকে পৃথিবীর দিকে এই বেতার তরঙ্গ পাঠানো হচ্ছে। কোন উৎস থেকে এই বেতার তরঙ্গ পৃথিবীর দিকে আসছে, সে সম্পর্কে নিশ্চিত নন গবেষকরা। এমনকি তরঙ্গের ধরন অথবা বিদ্যমান কোনো মডেলের মাধ্যমেও এর ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয়নি। গবেষকরা বলছেন, ৩৫ বছর ধরে এই উৎস নিয়মিত ২০ মিনিট দীর্ঘ শক্তিচ্ছটা পাঠাচ্ছে। যেগুলোর তীব্রতা একে অপরের চেয়ে আলাদা। যা কিছুটা পালসার বা দ্রুতগতির রেডিও ব্লাস্ট থেকে বেরিয়ে আসা বিস্ফোরণের মতো দেখায়। আর এগুলো স্থায়ী হয় কয়েক মিলিসেকেন্ড থেকে কয়েক সেকেন্ড পর্যন্ত।

নতুন করে খুঁজে পাওয়া উৎসের পাঠানো রেডিও সংকেতের স্থায়ীত্বকাল থাকে ২১ মিনিট পর্যন্ত। যা আগের ব্যাখ্যাগুলোর হিসাবে সম্ভব নয় বলা চলে। পালসার এক ধরনের নিউট্রন নক্ষত্র, যা অনেক দ্রুত আবর্তিত হয় ও বিভিন্ন রেডিও সিগনাল নিক্ষেপ করে। এগুলোর কোনোটি যখন পৃথিবী অতিক্রম করে, তখন খুবই সংক্ষিপ্ত সময়ে এর উজ্জ্বল নির্গমন লক্ষ্য করা যায়, অনেকটা ঘুর্ণায়মান লাইটহাউজের আলোর মতো।

নতুন খুঁজে পাওয়া এই উৎসের নাম দেওয়া হয়েছে 'জিপিএমজে ১৮৩৯-১০'। তবে, এটি ডায়াগ্রামের ডেথ লাইনের অনেক ওপরে অবস্থান করছে। এটি যদি কোনো পালসার হয় তবে এটি এমন উপায়ে পরিচালিত হচ্ছে যা বিজ্ঞানীদের ধারণায় অসম্ভব হিসেবে বিবেচিত। এমনকি এটি একটি অতি চৌম্বকীয় শ্বেত বামনও হতে পারে। যার মানে হচ্ছে, এগুলো এমন ধরনের নিউট্রন তারা যেখানে ব্যাপক শক্তিশালী চৌম্বকক্ষেত্র রয়েছে। তবে গবেষকরা বলছেন, সেগুলো থেকে এই ধরনের নির্গমন সাধারণত ঘটে না।

বিভিন্ন পুরনো নথি ঘেঁটে বিজ্ঞানীরা খুঁজে পেয়েছেন, অন্তত ১৯৮৮ সাল থেকে পৃথিবীতে এই ধরনের সংকেত আসছে। তবে সেটি ডেটা সংগ্রাহকদের চোখে পড়েনি। এই উৎস শনাক্ত করার পর গবেষকরা বিভিন্ন রেডিও আর্কাইভ যাচাই করে খুঁজে পান ৩৫ বছর ধরে ক্রমাগত এই সংকেত আসছে। নতুন আবিষ্কৃত উৎস কতটা অস্বাভাবিক, সে সম্পর্কেও এই ডেটায় কিছুটা ব্যাখ্যা পাওয়া যেতে পারে। সেই ক্ষেত্রে, ওই ডেটায় অন্যান্য বস্তুর অনুরূপ সংগ্রহ আছে কি না তা পরীক্ষা করতে হবে। আর এর মাধ্যমে গবেষকরাও এই নতুন করে খুঁজে পাওয়া নির্গমনের পেছনের কারণ বুঝতে সহায়তা পাবেন। এই অনুসন্ধান 'এ লং-পিরিয়ড রেডিও ট্রানজিয়েন্ট অ্যাক্টিভ ফর থ্রি ডিকেইডস' শীর্ষক গবেষণাপত্রে তুলে ধরা হয়।

ডিপফেইক ভিডিও শনাক্তে প্রযুক্তি

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার উন্নতির সাথে সাথে ডিপফেইক বানানো অনেক সহজ হয়ে গেছে। তাই খুব দ্রুত এটি শনাক্ত করার প্রযুক্তি বের করাও জরুরি হয়ে উঠেছে। ডিপফেইক ভিডিও হলো কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তি ব্যবহার করে একটি ভিডিওতে একজনের চেহারার জায়গায় অন্য একজনের চেহারা বসিয়ে দিয়ে কারও ডিজিটাল প্রতিমূর্তি বানানোর প্রযুক্তি। ইনটেল দাবি করেছে, তাদের কাছে সমাধান আছে। কোম্পানিটি প্রযুক্তিটির নাম দিয়েছে 'ফেইকক্যাচার'।

ইনটেল ল্যাবের গবেষক ইলকে দামির ব্যাখ্যা করেন, কিভাবে প্রযুক্তিটি কাজ করে। ভিডিওর মানুষটি যে সত্যিকারের, তা নিশ্চিত হওয়ার উপায় কী? প্রযুক্তিটির মূল কৌশল হলো 'ফটোপ্লেথিসমোগ্রাফি' (পিপিজি), যা রক্তপ্রবাহের পরিবর্তন শনাক্ত করে। তিনি বলেন, ডিপফেইকের মাধ্যমে তৈরি করা চেহারা এমন সিগন্যাল দেয় না। এছাড়া ভিডিওর সত্যতা যাচাইয়ে প্রযুক্তিটি চোখের নড়াচড়াও বিশ্লেষণ করে। যখন মানুষ কোনো কিছুর দিকে তাকায়, সাধারণত মানুষ একটি বিন্দুর দিকে তাকায়। কিন্তু ডিপফেইকের বেলায় চোখের দৃষ্টি কোনো নির্দিষ্ট বিন্দুতে স্থির থাকে না। এই দুটো কৌশল কাজে লাগিয়ে ইনটেল কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই সত্যিকারের ভিডিও এবং নকল ভিডিওকে আলাদাভাবে শনাক্ত করতে পারবে।

কোম্পানিটি দাবি করে তাদের ফেইকক্যাচার প্রযুক্তিটি শতকরা ৯৬ ভাগ নির্ভুল। এমন দাবির পর বিবিসি প্রযুক্তিটিকে পরীক্ষা করে দেখার আগ্রহ প্রকাশ করলে, তাতে রাজি হয় ইনটেল। বিবিসি জানায়, তারা সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডনাল্ড ট্রাম্প এবং বর্তমান প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের ডজনখানেক ভিডিও ক্লিপ ব্যবহার করে। যার মধ্যে কিছু আসল এবং কিছু এমআইটির তৈরি করা ডিপফেইক। পরীক্ষার পর বিবিসি জানায়, ডিপফেইক শনাক্ত করতে প্রযুক্তিটি বেশ কাজের। তাদের বাছাইকৃত নকলগুলোর মধ্যে বেশিরভাগই ছিলো লিপ-সিংকড ফেইক। যেখানে সত্যিকারের ভিডিওগুলোতে মুখ এবং কণ্ঠস্বর বদল করা হয়েছিল। সেগুলোর প্রতিটিকেই সফলভাবে শনাক্ত করতে সক্ষম হয় প্রযুক্তিটি। তবে আসল ভিডিও পরীক্ষার বেলায় কিছুটা গড়বড় করে প্রযুক্তিটি। বেশ কয়েকবার আসল ভিডিওকে নকল বলে চিহ্নিত করে ফেইকক্যাচার। ভিডিওতে পিক্সেলের সংখ্যা যত বাড়ে রক্ত চলাচল শনাক্ত করা ততটাই কঠিন হয়ে যায় প্রযুক্তিটির জন্য। প্রযুক্তিটিতে অডিও বিশ্লেষণের কোনো সুযোগ নেই।

ডিপফেইক খুবই সূক্ষ্ম হতে পারে। দুই সেকেন্ডের একটি ক্লিপ পরিবর্তন করে সেগুলোকে রাজনৈতিক প্রচারণায় ব্যবহার করা যেতে পারে। সেগুলো নিম্নমানের হতে পারে। কণ্ঠস্বর বদলে দিয়েও একটি নকল ভিডিও বানানো যেতে পারে। প্রতিযোগিতাপূর্ণ বাস্তব দুনিয়ার ব্যবহারের জন্য ফেইকক্যাচারের সক্ষমতা এখনো প্রশ্নবিদ্ধ। পরিসংখ্যান অনুযায়ী ফেসিয়াল রিকগনিশনের মতো প্রযুক্তিগুলো নির্ভুলতার হার সাধারণত খুবই উচ্চ হয়। কিন্তু বাস্তবে প্রয়োগে সেগুলোও ততটা নির্ভুল নয়। ইনটেলের দাবি, ফেইকক্যাচারকে কঠোর পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে। এর মধ্যে ছিলো ওয়াইল্ড টেস্ট। যেখানে ১৪০টি নকল ভিডিও এবং সেগুলোর আসল অংশগুলোকে একই সঙ্গে পরীক্ষার জন্য প্রযুক্তিটিকে দেয় কোম্পানিটি। সেই পরীক্ষায় সাফল্যের পরিমাণ ছিল ৯১ শতাংশ।

তবে অনেক গবেষক ইনটেলের এই প্রযুক্তিটি নিজেরা স্বাধীনভাবে পরীক্ষা করে দেখতে চেয়েছেন। তারা বলছেন, ইনটেল নিজেদের প্রযুক্তিকে নিজেরা পরীক্ষা করে একটা ফলাফল ঘোষণা করবে, সেটা যথেষ্ট নয়। বাস্তব দুনিয়ায় ব্যবহারের জন্য সিস্টেমটি কতোটা নির্ভুল সেটা তাদের মতো করে পরীক্ষা করে দেখা জরুরি। তবে এই প্রযুক্তি নিশ্চিতভাবে সম্ভাবনাময় বলছে বিবিসি।

সংবাদ উপস্থাপনায় এআই

বিশ্বের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এরই মধ্যে এআইয়ের ব্যবহার শুরু করেছে। এমনকি টেলিভিশন চ্যানেলে খবর পড়ছে এআই। সম্প্রতি দেশের একটি বেসরকারি টেলিভিশনে অপরাজিতা নামে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তির এক উপস্থাপিকা সংবাদ পড়ে। যাতে অনেকেই হতবাক হন। কিছুদিন আগে ভারতেও একজন এআই উপস্থাপিকা সানাকে দেখা যায় খবর উপস্থাপনা করতে। ২০১৮ সালে চীনের শিনহুয়া বার্তা সংস্থা চালু করেছিল বিশ্বের প্রথম এআই পরিচালিত সংবাদপাঠক। এতে ব্যবহার করা হয়েছিল কম্পিউটার গ্রাফিকস। কিন্তু চলতি বছর সংস্থাটি প্রকাশ্যে এনেছে তাদের প্রথম এআই পরিচালিত সংবাদ পাঠিকা। চলতি বছর রাশিয়ার সভয়ে টিভি তাদের প্রথম ভার্চুয়াল আবহাওয়া উপস্থাপক হিসেবে স্লেজানা তুমানোয়াকে পরিচয় করিয়ে দেয়।

এআই-এর ব্যবহার যেমন কাজকে সহজ করছে, তেমনি ঝুঁকিতে পড়ছে নানান পেশা। গবেষকরা বলছেন এআই ব্যবহারে আগামী ২৫ বছরের মধ্যে হয়তো হারিয়ে যাবে অনেক পেশা। এর মধ্যে থাকতে পারেন সাংবাদিকরাও। তবে অনেক গবেষক এ-ও বলছেন, জেনারেটিভ এআই'র মাধ্যমে কত চাকরি প্রতিস্থাপিত হবে তা জানার কোনো উপায় নেই। কিন্তু মানুষ ও এআইয়ের সমন্বয়ের মাধ্যমে গড়ে উঠতে পারে পৃথিবীর ভবিষ্যৎ।